Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XIII, Issue-III, April 2025, Page No. 28-33
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

হরিশংকর জলদাসের 'কৈবর্তকথা': জেলে সমাজের অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবন

প্রকাশ হালদার, *সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, চাকদহ কলেজ, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 06.04.2025; Accepted: 22.04.2025; Available online: 30.04.2025
©2025 The Author(s). Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Harishankar Jaldas is one of the most prominent voices representing the subaltern people in contemporary Bengali literature. His depiction of the marginalized fishermen community is deeply rooted in his own memories of life. Having faced racial discrimination throughout his student days and professional life due to his surname, he was inspired to delve into the history of the fishermen community. In response to the racist attitudes of society, he used his pen as a tool to portray the socio-cultural, economic, and religious beliefs of marginalized people in his writings.

This article explores the cultural world, religious beliefs, customs, and economic conditions of the fishermen community. Once, the fishing community held considerable ethnic prestige in society. However, today, they are racially oppressed, economically distressed, politically and culturally neglected. They, themselves, are largely responsible for this decline. Presently, there is a growing tendency among them to abandon their surname, traditions, and culture. To restore the lost dignity of the fishermen community, it is crucial to bring their socio-cultural practices, religious beliefs, and economic activities into the light of research.

Keywords: subaltern, culture, society, fishermen, racial discrimination

বহুধাবিভক্ত উচ্চবর্গীয়দের প্রাধান্যযুক্ত বাঙালি সমাজে, নিম্নবর্গীয়রা অনেকাংশে প্রান্তিক হওয়ায় তাঁদের নিজস্ব সমাজ-সংস্কৃতি, জীবিকা অনুশীলনের পদ্ধতি অনেক ক্ষেত্রে নিজ সমাজের গণ্ডি অতিক্রম করতে সক্ষম হয় না। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ খাদ্য সংগ্রহকারী থেকে খাদ্য উৎপাদকে পরিণত হলেও, মৎস্যজীবীরা আজও খাদ্য সংগ্রহকারীতেই থেকে গিয়েছে। ফলে জীবনযাত্রার প্রতিটি ক্ষেত্রেই মৎস্যজীবী সমাজের যে নিজস্বতা রয়েছে, তা সাহিত্য জগতে অনেকাংশেই অবহেলিত। হরিশংকর জলদাস ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রামের বঙ্গোপসাগর তীরবর্তী উত্তর পতেংগা গ্রামের এক জেলে পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।জেলে পরিবারের সন্তান হওয়ায় হরিশংকর জলদাস খুব সহজেই এই সমাজের নিজস্বতাকে সাহিত্যের মাধ্যমে বৃহত্তর সমাজের কাছে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন।শাস্ত্রানুসারে কৈবর্তদের দুটি ভাগ- হালিক কৈবর্ত ও জালিক কৈবর্ত।যেসব কৈবর্তরা চাষবাস করেন তাঁরা হালিক কৈবর্ত এবং মাছ ধরে যেসব কৈবর্তরা জীবিকা নির্বাহ করেন তাঁরা জালিক কৈবর্ত নামে পরিচিত। এই প্রবন্ধে হরিশংকর জলদাসের 'কৈবর্তকথা' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'কৈবর্তজীবনের চালচিত্র, জালচিত্র' ও 'কৈবর্তসমাজের ধর্ম ও সংস্কৃতি' প্রবন্ধের প্রেক্ষাপটে জালিক কৈবর্ত বা মৎস্যজীবী জেলে সমাজের অর্থনৈতিক দুর্দশা, তাঁদের সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় জীবন আলোচিত হয়েছে।

অর্থনৈতিক জীবন

হরিশংকর জলদাস তাঁর 'কৈবর্তজীবনের চালচিত্র, জালচিত্র' প্রবন্ধে ব্রাত্য বা অস্পৃশ্য জেলেদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক চিত্র অঙ্কন করেছেন।জেলেদের অবক্ষয়ের সামাজিক,রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবক্ষয়ের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে,লেখক ইতিহাস আশ্রয়ী হয়ে কৈবর্ত বিদ্রোহের কথা উল্লেখ করেছেন। পালশাসনে দীব্যোকের

নেতৃত্বে কৈবর্তরা বিদ্রোহ করলেও, রামপালের কাছে কৈবর্তরা পরাজিত হলে যে অবক্ষয় সূচনা হয়, তা থেকে আজও তাঁরা উঠে আসতে পারেনি। তিনি লিখেছেন-

> "সেদিন রামপালের হাতে পরাস্ত কৈবর্তরা সেই যে কোণঠাসা হয়ে পড়ল, মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ল, আজ পর্যন্ত গা থেকে ধূলি ঝেড়ে সম্মিলিতভাবে আর উঠে দাঁড়াতে পারল না।যুগ- যুগান্তর ধরে দুরাচারী বর্ণবাদীদের দ্বারা তারা নিপীড়িত হতে থাকল, ধনলিপ্সু মৎস্যজীবীদের হাতে মাছ ধরার ব্যবসা হারাল, রাজনীতিকদের হাতে পুতুলের মত ব্যবহৃত হতে থাকল।"[১]

তাঁর মতে কৈবর্ত বিদ্রোহের সময়, কৈবর্তরা জয়ী হলে আজকে বাংলার সংস্কৃতিক ইতিহাস অন্যভাবে লেখা হতো। হরিশংকর জলদাস তাঁর এই প্রবন্ধে চট্টগ্রামের জেলে সমাজের চিত্র অঙ্কন করলেও, লেখকের কোথায় এটি গোটা বাংলাদেশের সার্বিক চিত্র।এই প্রবন্ধে জেলে সমাজের শোষিত হওয়ার, মাছ ধরার মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার, শিক্ষার প্রতি অনীহা,বাল্যবিবাহ সর্বোপরি শিক্ষিত জেলেদের জাতে ওঠার চেষ্টার কথা উঠে এসেছে।

চট্টগ্রামের জেলেদের কথা বলতে গিয়ে তিনি সমুদ্র নির্ভর জেলে ও নদী নির্ভর জেলে এই দুই গোষ্ঠীর কথা বলেছেন।জেলেদের জীবিকা জলকেন্দ্রিক হওয়ায় স্বভাবতই জেলে বসতি গুলি নদী বা সমুদ্র পাড়ে গড়ে ওঠে।চট্টগ্রামের সমুদ্র তীরবর্তী জেলেরা বিহিন্দিজাল, টংজাল, হুরিজাল, প্রভৃতি জাল দিয়ে মাছ ধরে কোনক্রমে সংসার চালানোর চেষ্টা করে থাকে।তবে এই কাজ করে তাঁদের হাতে পর্যাপ্ত অর্থ আসে না। ফলে তাঁরা দাদনদার, সুদের কারবারিদের ফাঁদে পা দিতে বাধ্য হন।জেলেদের অভাবের কথা বলতে গিয়ে তিনি লিখেছেন –

> "ভরা নদী মরে গেছে
> মাছ নেই তো আর,
> জাইল্যানির সংসারেতে
> অভাব বেশুমার।"[২]

জেলেদের অভাবের কারন হিসাবে সন্তানাধিক্য ও আয়ের স্বল্পতাকে লেখক চিহ্নিত করেছেন। বর্ষাকালে মাছের বিশেষ করে ইলিশের প্রতুলতার কারণে জেলেদের জীবনে সুখের আলো আসার কথা থাকলেও, তাঁরা দাদনদার, ফড়েদের দৌড়াত্মে বা কুটকৌশলে আজ নিঃস্ব হওয়ার পথে।মাছ ধরার মরশুমে বেশিরভাগ জেলেরাই ঋণ নিতে বা দাদন নিতে বাধ্য হন। বর্ষাকাল শুরু হওয়ার আগে থেকেই জেলে পাড়ায় দাদনদারদের আনাগোনা শুরু হয়ে যায়। তাঁরা বিভিন্নভাবে জেলেপাড়ার বাসিন্দাদের প্রলুব্ধ করে দাদন নিতে।

জেলেদেরকে শোষণ করার জন্য দাদনদাররা বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে থাকে।জেলেরা মাছ নিয়ে কূলে উপস্থিত হলেই দাদনদারা সেই মাছের দখল নিয়ে নেয়। দাদনদারদের নির্ধারিত মূল্যেই জেলেদেরকে, তাঁদের কাছে মাছ বিক্রি করতে বাধ্য করে। তাঁরা অধিকাংশ সময় মাছ ধরার কাজে ব্যস্ত থাকায়,মাছ বরফজাত করার সময় বা কৌশল আয়ত্ত করতে পারেনা।বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই জেলেরা মাছ স্বল্প দামে বিক্রি করে দিতে বাধ্য হলেও, বিক্রিত অর্থের সম্পূর্ণটা তাঁদের হাতে আসে না।দাদনদাররা প্রথমে জেলেদের কাছ থেকে দাদন বাবদ অর্থের সুদ হিসেবে হাজারে ২০০ টাকা কেটে নিয়ে,বকেয়া অর্থ মরশুমের শেষে দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দেন।দাদনদারদের প্রতিশ্রুতির পরিণতির কথা বলতে গিয়ে লেখক লিখেছেন

> "জেলেরা টাকা-আনা-পাইয়ের হিসেব জানে না, ক্যালকুলেটর মেশিনের কারসাজি বোঝেনা। ফলে মরশুমের শেষে তাদের ভাগ্য কীভাবে নির্ধারিত হয় সহজেই অনুমেয়।"[৩]

বর্তমানে জেলেদের পথে বসাতে দাদনদারেরা যে, কোনও চেষ্টারই কসুর করছে না; হরিশংকর জলদাসের বর্ণনায় তা উঠে এসেছে।মুসলিমরা প্রথাগতভাবে মৎস্যজীবী না হলেও, তাঁরাও আজ এই পেশায় আসতে বাধ্য হচ্ছেন জীবিকার সন্ধানে।ফলে চিরাচরিত গরিব হিন্দু মৎস্যজীবীদের জীবিকার ক্ষেত্রটি সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে।দাদনদারেরা অতিরিক্ত অর্থের লোভে, সন্দীপ-হাতিয়া প্রভৃতি জায়গা থেকে মুসলিম মৎস্যজীবীদের ভাড়া করে নিয়ে এসে, সকল উপকরণ দিয়ে তাঁদেরকে মাছ ধরার কাজে নিযুক্ত করছেন। বংশ-পরম্পরায় মৎস্যজীবীরা সমুদ্রের একটি নির্দিষ্ট স্থানে পারস্পরিক দূরত্ব বজায় রেখে জালপাতে যা 'পাতা'[৪] নামে পরিচিত।কারণ মাছ ধরার জায়গা গুলি বা পাতাগুলি কাছাকাছি হলে কারোর জালেই মাছ পরেনা।এইসব ভাড়াটিয়ে মৎস্যজীবীরা দাদনদারদের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে

জেলেদের জালের সামনেই জাল পাতেন। ফলে জোয়ারের সময় তাঁদের জালেই মাছ ওঠে,প্রকৃত জেলেদের জাল মাছ শূন্য থেকে যায়। দাদনদারদের উৎপিরনের কথা বলতে গিয়ে লেখক লিখেছেন –

> "দাদন-গ্রহীতা জেলেদের কমবেশি রেহাই দিলেও যে জেলে দাদন নেয় না, দাদনকারীরা তাদেরকে কোনোক্রমেই স্বস্তিতে জাল বসাতে দেয় না।"[৫]

সমুদ্র তীরবর্তী মৎস্যজীবীদের বহুমাত্রিক সংকটের চিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন-

> "সমুদ্র আজ তাদের নেই। জাল পাতার স্থানসমূহ ছিনতাই হয়ে গেছে।মাছ ধরার উপকরণ কেনার পয়সা আজ তাদের হাতে নেই।ধৃতমাছ বাজারে - হাটে বিক্রি করার যে স্থানটি তাদের জন্য নির্ধারিত ছিল তা-ও আজ জবরদখল হয়ে গেছে।"[৬]

তাঁর এই বর্ণনা থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, চট্টগ্রাম অঞ্চলের সমুদ্র নির্ভর চিরাচরিত মৎস্যজীবীরা আজ ধ্বংসের মুখে দাঁড়িয়ে। স্বাধীন মৎস্যজীবীরা আজ জলমজুর হয়ে দাদনদারদের নৌকায় কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে। কেউ বা পেশা পরিবর্তন করে রিক্সা চালাচ্ছে। আবার অনেকে জেলেনারীরা গোপনে বা প্রকাশ্যে ভিক্ষাবৃত্তি করে দু'মুঠো ভাতের যোগান করছে।

হরিশংকর জলদাসের বর্ণনায় চট্টগ্রামের কর্ণফুলী, মাতামুহুরী, হালদা,সাঙ্গু প্রভৃতি নদী-উপনদীর তীরে বসবাসকারী জেলেদের দুর্দশার চিত্র উঠে এসেছে। একসময় এইসব নদী মাছে পরিপূর্ণ হওয়ায় মৎস্যজীবীরা সুখ-স্বাচ্ছন্দে দিন কাটাতো, এই সব নদীতে মাছ ধরে। বিভিন্ন কারণে এখানকার মৎস্যজীবীরা আজ সংকটে। একদিকে যেমন কলকারখানার বজ্র পদার্থের প্রকোপে নদীতে মাছ কমে যাচ্ছে; অন্যদিকে মৎস্য শিকারিদের সংখ্যা বাড়ার ফলে নদীর মাছও দ্রুত শেষ হয়ে যাচ্ছে। ফলে এই অঞ্চলের জেলেরা মাছ ধরার পরিবর্তে ,সংসার চালানোর জন্য বিকল্প পেশা হিসাবে মাছ বিক্রি ও মাছ কাটার পেশাকে গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছেন। তবে বিকল্প পেশায়ও দৈনিক উপার্জন এতই কম যে,তাদিয়েও তাঁদের সংসার চালানো সম্ভব হয় না।

হরিশংকর জলদাস তাঁর 'কৈবর্তজীবনের চালচিত্র, জালচিত্র' প্রবন্ধে জেলে সমাজে শিক্ষার অভাবের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে পরিবারের মধ্যে সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার এক অবিশ্বাসের চিত্র খুজে পেয়েছেন। তিনি লিখেছেন-

> "কথায় বলে মানুষ দেখে শেখে, কিন্তু এই কথাটি শিক্ষার বেলায় জেলেদের জন্য প্রযোজ্য নয়।শিক্ষায় আলো আছে, অর্থনৈতিক দুর্বিষহতা থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় শিক্ষা গ্রহণ -এই ব্যাপারটি জেলেরা দেখে শিখতে নারাজ । তাদের বিশ্বাস- শিক্ষা নিকটআত্মীয়কে দূরে সরিয়ে দেয়, আপনকে পর করে ছাড়ে।"[৭]

তবে এই অবিশ্বাস একেবারে অমূলক নয়।চট্টগ্রাম অঞ্চলের জেলে সমাজে দেখা যায় যে,অধিকাংশ উচ্চ শিক্ষিত জেলে সন্তানরায় তাঁদের পরিবার ত্যাগ করে বর্ণহিন্দু সমাজের উচ্চশিক্ষিত মেয়েকে বিয়ে করে শহরবাসী হচ্ছেন।এইসব শিক্ষিত জেলে সন্তানদের মধ্যে আবার নিজ পদবী ত্যাগ করে উচ্চ বর্ণের পদবিগ্রহণ করার প্রবণতাও খুব বেশি। এটাকে বিখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ শ্রীনিবাসন বর্ণিত 'সংস্কৃতায়ন' প্রক্রিয়ার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।যেখানে সাধারণত নিম্নবর্ণের লোকেরা উচ্চবর্ণের আদব-কায়দি, রীতিনীতি অনুকরণ করেন জাতে ওঠার জন্য। অন্য সমাজে বিয়ে করার কারণে, জেলে পরিবারের সন্তানরাও শ্বশুরবাড়িতে যথাযথ সম্মান পায় না। অন্যদিকে জেলে শ্বশুর-শাশুড়িও বৌমার কাছে আন্তরিকতা ও ভালোবাসা পায় না। ফলে পিতা-মাতার মনে এক গভীর ক্ষোভের জন্ম হয়। তিনি লিখেছেন

> "তারা ভাবছে- নিজ সন্তানকে পড়ালেখা করানোর কারণে আজ সে তাদের কাছে অন্য গ্রহের মানুষ হয়ে গেছে। অশিক্ষিত পুত্র কখনো মা-বাবাকে ত্যাগ করতো না, তাদের ভুলতো না। প্রধানত এই কারণে জেলেরা তাদের সন্তানকে শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে খুব বেশি আগ্রহী হয়ে উঠছে নি আজও।"[৮]

জেলে সমাজ আজও বাল্যবিবাহের করাল ছায়া থেকে মুক্ত হতে পারেনি। সাধারণত ১২-১৫ বছরের মধ্যেই মেয়েদের বিয়ে হয়ে যায়। জেলে সমাজে মেয়েদের মধ্যে পড়াশুনোর হারও খুব কম। এর কারণ হিসেবে লেখক দুটি বিষয়কে চিহ্নিত করেছেন। মা বাবার অর্থনৈতিক দুরবস্থা যেমন দায়ী; তেমনি নারী শিক্ষার প্রতি জেলে মা-বাবাদের অনীহাও এর জন্য দায়ী। তাছাড়া সামাজিক একটি বিষয়ের প্রতি লেখক দৃষ্টি আকর্ষণ করে দেখিয়েছেন যে, জেলে পরিবারের মেয়েরা উচ্চশিক্ষিত হলে তাঁদের জন্য উপযুক্ত বিবাহযোগ্য পাত্র পাওয়া মুশকিল হয়ে যায়। কারণ জেলে পরিবারের উচ্চ শিক্ষিত ছেলেরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বর্ণহিন্দু পরিবারে বিয়ে করে। ফলে মেয়ে বেশি শিক্ষিত হলে জেলে কন্যারা অবিবাহিত থেকে যায়। কন্যাদায়গ্রস্থতা থেকে মুক্ত হতে গিয়ে পরিবারের মা-বাবারা আজও এইসব অঞ্চলে মেয়েদেরকে শিক্ষিত করতে চাননা।

ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবন

জেলেদের জীবিকা মূলত মাছ ধরা। ফলে এদের বাঁচা- মরা সবই জলের উপর নির্ভরশীল। হরিশংকর জলদাস 'কৈবর্তসমাজের ধর্ম ও সংস্কৃতি' প্রবন্ধে দেখিয়েছেন- বারো মাসের মধ্যে ফাল্গুন, চৈত্র ও বৈশাখ এই তিন মাস জেলেদের জন্য অর্থনৈতিকভাবে খুবই কষ্টকর। কারণ এই সময় গ্রীষ্মের তীব্র দাবদহে নদী-নালা,খাল-বিল, সবই জলশূন্য হয়ে যায়। কোথাও তাঁরা এই সময় মাছের খোঁজ পায় না। চৈত্র মাসের শেষে জেলেদের খাদ্য অভাবের সঙ্গে দুর্ভিক্ষে তুলনা করে তিনি লিখেছেন-

> "পুরুষরা নিষ্কর্মা দিন কাটায়। বাচ্চাকাচ্চারা ক্ষুধায় যন্ত্রণায় অতিষ্ট হয়ে ঘনঘন মায়ের মুখের দিকে তাকায়।"[৯]

এই প্রবন্ধে হরিশংকর জলদাস,জেলে সমাজের ধর্মবিশ্বাস ও সাংস্কৃতিক জীবনের বর্ণনা দিতে গিয়ে, বর্ণ হিন্দুদের দুর্গাপূজা কিংবা মুসলমানদের ঈদের মতো জেলে সমাজে প্রধান উৎসব হিসেবে গঙ্গাপূজা, মনসাপূজা, চৈত্র সংক্রান্তির 'যাগ' অনুষ্ঠানের গুরুত্বের কথা তুলে ধরেছেন। চৈত্র মাসের শেষ দিন জেলে সমাজের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। নিদারুণ দুঃখের মাঝে তাঁদের কাছে এই দিনটি আলাদা করে আনন্দ ও খুশি বয়ে আনে। চৈত্র সংক্রান্তির আগের দিন জেলেনিদের হাতে যা কিছু টাকা থাকে তাই দিয়ে বাজার থেকে সিদ্ধচাল, খই, ধান, গুড়, নারকেল কাঁচাবাদাম প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য কিনে আনা হয়। এই সব দ্রব্য দিয়ে বাড়ির মহিলারা সারা রাত জেগে খই-মুড়ি ভাজে, মোয়া, নাড়ু বানায়। অন্যদিকে বাচ্চারা দল বেঁধে গাছের লতা-পাতা, ডাল, শিকড়, নিমপাতা, থানকুনি পাতা, বাসক পাতা সংগ্রহ করে উঠানের মাঝখানে স্তুপকরে রাখে,চৈত্র সংক্রান্তির ভোরবেলা 'যাগ' দেওয়ার জন্য।

উপমহাদেশের ইতিহাসে জেলে সমাজের অস্তিত্ব বহু প্রাচীন। চৈত্র সংক্রান্তির সকালে অনুষ্ঠিত জেলে সমাজের 'যাগ' অনুষ্ঠানের কথা বলতে গিয়ে লেখক লিখেছেন

> "এই ইতিহাস উচ্চবর্ণীয় সামাজিক ইতিহাস থেকে ভিন্ন, কিন্তু বৈদিক প্রথা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়।"[১০]

অর্থাৎ তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে,বৈদিক অনুষ্ঠান রূপে জেলে সমাজে এই প্রথা প্রচলিত রয়েছে। অথর্ববেদে ভেষজ চিকিৎসা পদ্ধতি, বিভিন্ন আচার- অনুষ্ঠান, কালাজাদু বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। হরিশংকর জলদাস মনে করেন, ধীবর কন্যা সত্যবতীর পুত্র ও বেদের সংকলক ব্যাসদেব বিন্যস্ত অথর্ববেদের নির্দেশ গুলোই বর্তমানের জেলে সমাজ পালন করে চলেছে ।

একজন অভাবী জেলে নারীর আকাঙ্ক্ষা পূরণের অনুষ্ঠান হল 'যাগ'। প্রত্যেক সন্তানবতী জেলে মায়েরা সন্তানদের বিপদ-আপদ, রোগের হাত থেকে রক্ষা ও সম্পদ লাভের জন্য ডাল-পালা, লতা, প্রভৃতি সামগ্রীতে পূর্বমুখী হয়ে আগুন দেয়, চৈত্র সংক্রান্তির ক্রান্তির সকালে। 'যাগ' অনুষ্ঠানের বর্ণনা করতে গিয়ে লেখক লিখেছেন "'যাগে'র পাশে দাঁড়ানো সন্তানদের চোখে- মুখে সমস্ত শরীরে যাগ থেকে নির্গত ধোঁয়া লাগে। এই সময় জেলে নারীরা উচ্চস্বরে বলে ওঠে-

> "যাগরে যাগ, যত আপদ বালাই আছে,
> বিয়াগিন হাতদইজ্যা পারই যাক।
> যত টিয়া পইসা ধন-দৌলত আছে,
> বিয়াগিন আর পোয়ার সিন্দুকত্ থাক্।

যত রোগবালাই আছে, যত শত্রু আছে,
বিয়াগিন হাতদইজ্যা পারই যাক্ ।"[১১]

চৈত্র সংক্রান্তির 'যাগ' অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ঐদিন প্রতিটি জেলে পরিবারে পাঁচন রান্নার চল লক্ষ্য করা যায়। গ্রাম্য জীবনে যত ধরনের শাক-সব্জি, খাওয়ার যোগ্য ফল, লতাপাতা পাওয়া যায় তার সবকিছু দিয়ে পাঁচন রান্না করা হয়। পাচনখাওয়াকে কেন্দ্র করে জেলে পরিবারে আত্মীয়-স্বজন পাড়া-প্রতিবেশীদের পরস্পরের বাড়িতে যাওয়ার প্রচলন লক্ষ্য করা যায়।

জেলে সমাজের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান হল পয়লা বৈশাখ। হরিশংকর জলদাস, শহরের পয়লা বৈশাখ পালনের সঙ্গে গ্রাম্য সমাজের মূলত জেলেদের পয়লা বৈশাখ পালনের অনুষ্ঠানের তুলনা করে লিখেছেন-

"জলপুত্রদের বৈশাখ যাপন ন্যাকামি তে পূর্ণ নয়, বরং প্রাণের ছোঁয়ায় উজ্জীবিত। জেলেদের মধ্যে ওই দিন পান্তা ভাত খাওয়ার ধুম পড়ে না; বরং সারা বছরে পান্তাভাত গলাধঃকরণের দুঃসহ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি চায় তারা।"[১২]

লেখকের মতে শহুরে পয়লা বৈশাখ যেখানে নানারকম উচ্ছ্বাস, 'মেকি আচরণে' আক্রান্ত সেখানে গ্রাম্য জীবনে পয়লা বৈশাখ আলাদা করে তাৎপর্য বয়ে আনে। তাঁদের কাছে পয়লা বৈশাখ কোনও ক্ষনিকের আনন্দ নয়। জেলে সম্প্রদায় পয়লা বৈশাখকে বরণ করে নেওয়ার জন্য গোটা চৈত্র মাস জুড়ে প্রস্তুতি নেয়।

জেলে সমাজের চিরাচরিত বিশ্বাস অনুযায়ী পয়লা বৈশাখের সকাল বেলা জেলে সন্তানরা নদী থেকে স্নান করে আসার পর, শরীরের উন্মুক্ত অংশে বাটা করে রাখা হলুদ ও নিম পাতা মাখে। তাঁরা বিশ্বাস করে এতে করে সারা বছর ঘা-পাচাড়ার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।এরপর তাঁরা নতুন বা পুরনো ধোঁয়া পরিষ্কার জামা পরে দুই হাতের মুঠোতে খই নিয়ে চিরাচরিত প্রথা মাফিক বাতাসে উড়িয়ে দেয়। তাঁদের বিশ্বাস খই যেভাবে বাতাসে উড়ে দূরে চলে যায়, একইভাবে শত্রুরাও দূরে সরে যাবে। এরপর জেলে পুরুষরা সবাই তাঁদের চেয়ে বয়স্কদের প্রণাম করতে বেরিয়ে পরে পাড়ায়-পাড়ায়।সমাজের অভ্যন্তরীণ পারস্পরিক ভেদাভেদ ভুলে এই প্রক্রিয়া সন্ধ্যেবেলা পর্যন্ত চলতে থাকে জেলেপাড়া গুলিতে।।

জেলা সমাজ বিভিন্ন প্রথাগত লৌকিক সংস্কার মেনে চলে।পঞ্জিকা মতে তাঁরা মাছ ধরার জন্য সমুদ্রযাত্রা করে থাকেন।নৌকা জলে ভাসানোর সময় বিশ্বাস অনুযায়ী বিভিন্ন লৌকিক দেবদেবীর ধ্বনী দেন। জেলে সমাজের কাছে আষাঢ় ও শ্রাবণ মাস খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই দুই মাস তাঁদের কাছে সুখ- স্বাচ্ছন্দ বয়ে নিয়ে আসে। আষাঢ়- শ্রাবণে খাল বিল নদী নালা সব জলে ভরে থাকে। এই সময় তাঁদের অভাব দূর হয়ে সুখ আসে।জেলে সমাজের প্রধান আরদ্ধ দেবী মামনসা ও মাগঙ্গার পুজো আষার-শ্রাবণ মাস কে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হয় হয়।জেলেদেরকে জীবিকার জন্য সব সময় জলের উপর নির্ভর করতে হয়। সাপ মূলত জলের হিংস্র প্রাণী।সেই জন্য সাপের সঙ্গে জেলে সমাজের কোনও বিরোধ চলে না। লেখকের কথায়

"মনসা দেবী জেলেদের ভক্তিমূলক শ্রদ্ধা পান।"[১৩]

এছাড়াও জেলেরা জিনপরী,দক্ষিণারয়,বনবিবি,মেছোপত্নী ও বিভিন্ন পীরবাবাদের অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস করে।

সাধারণত আষাঢ় মাসের প্রথম সপ্তাহে জেলে সমাজ সর্বজনীনভাবে গঙ্গা পূজোর আয়োজন করা হয়ে থাকে নদী বা সমুদ্রের পারে।হরিশংকর জলদাসের লেখায় গঙ্গা পুজোর বর্ণনা পাওয়া যায়-

"উত্তরমুখী করে মাটির একটি বেদি তৈরি করা হয়। সেখানে বসানো হয় জলভর্তি মাটির একটি ঘট। তার ওপর থাকে ডাঁটাসুদ্ধ একটা আস্ত নারকেল এবং আম্রপল্লব। বেদির পেছনে পোঁতা হয় একটি কচি কলাগাছ। ঘটের সামনে সাজিয়ে দেওয়া হয় নৈবেদ্য। গভীর শ্রদ্ধায় জ্বালানো হয় ধূপ-মোমবাতি।"[১৪]

জেলেপাড়ার সবাই হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে এই পুজোয় অংশগ্রহণ করে। গঙ্গা পুজোয় কোথাও- কোথাও আবার পাঠা বলি দেবার প্রথা প্রচলিত রয়েছে।জেলে সমাজের সকলে যথাসম্ভব নতুন জামা কাপড় পরে মনের হিংসা, কালিমা দূর করে গঙ্গা পূজায় সমবেত হয়। তাঁরা বিশ্বাস করে, মন থেকে হিংসা দূর হলে মা গঙ্গার আশীর্বাদ লাভ করা যায়।

গঙ্গা পূজা শেষে জেলে নারীরা কুলোয় পঞ্চপ্রদীপ জ্বালিয়ে পূজোর স্থান থেকে সামান্য দূরে জলের পাশে বেঁধে রাখা নৌকাতে সিঁদুরের টিপ দিতে-দিতে প্রার্থনা করে বলেন

> "মা-গঙ্গা। তুমি আমাদের দিকে একটু সুনজর দিয়ো। তুমিই আমাদের জীবন, তুমিই আমাদের মরণ। তুমি দয়া করে আমাদের স্বামী-পুত্রদের বেশি করে মাছ দিয়ো । তুমি যদি মাছ না দাও, তাহলে স্বামী-সন্তান নিয়ে আমরা উপোস থাকবো। তুমি দয়া করো মা, যেন আগামী বছর এরকম করে তোমার পুজো দিতে পারি।"[১৫]

শ্রাবণ মাস জেলেদের কাছে বড় সুখের। গোটা শ্রাবণ মাস জুড়ে জেলে পাড়ার প্রতিটি বাড়িতে মনসা পূজোর আয়োজন করা হয়।তাছাড়াও এই সময় প্রতিটি বাড়িতে মনসা পুঁথি পাঠের আয়োজন করা হয়।এইসব মনসা পুঁথি পাঠের আসরে অর্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিত জেলেদের রচিত বিভিন্ন বিচ্ছেদ মূলক গান, হারমোনিয়াম, ঢোল, কাঁসা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র সহকারে পরিবেশন করা হয়।এইসব পুঁথি পাঠের আসরে মূল আকর্ষণ রূপে থাকে ১৪ থেকে ১৬ বছরের কিশোরেরা। যারা মেয়ে সেজে নৃত্য পরিবেশন করে।

বর্ষাকাল অতিক্রান্ত হলে জেলে সমাজে প্রকৃতির নিয়মে আবার অভাব নেমে আসে।জেলে সমাজ এখনও অশিক্ষার অন্ধকারে নিমজ্জিত।পারস্পারিক দলাদলি, হিংসা যেন এই সমাজেরই অংশ। নিজেদের ঐতিহ্যের সন্ধানে, পারস্পরিক বিদ্বেষ-হিংসা ভুলে, জেলে সমাজ এইসব লৌকিক উৎসব -অনুষ্ঠানে একত্রিত হয়। হরিশংকর জলদাস মনে করেন, এত সবকিছুর পরেও এইসব পুজো পার্বণ এই জনগোষ্ঠীকে এক সূত্রে বেঁধে রেখেছে।

তথ্যসূত্র

১. জলদাস, হরিশংকর, কৈবর্তকথা,মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, মে ২০১৯,পৃ.৬৭
২. তদেব, পৃ.৬৬
৩. তদেব, পৃ.৬৯
৪. তদেব, পৃ.৬৯
৫. তদেব, পৃ.৬৯
৬. তদেব, পৃ.৭০
৭. তদেব, পৃ.৬৭
৮. তদেব, পৃ.৬৮
৯. তদেব, পৃ.৭৪
১০.তদেব, পৃ.৭৪
১১.তদেব, পৃ.৭৫
১২.তদেব, পৃ.৭৫
১৩.তদেব, পৃ.৭৬
১৪.তদেব, পৃ.৭৭
১৫.তদেব, পৃ.৭৭

সহায়ক গ্রন্থ

১. জলদাস, হরিশংকর, নদীভিত্তিক বাংলা উপন্যাস ও কৈবর্ত জনজীবন, কথাপ্রকাশ, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০২১
২. Srinivas, M.N, Social Change in modern India, University of California Press, Berkely, california,1968